MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড
www.vanguardonline.info | www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র।
ফেব্রুয়ারি ২০২১
দাম : দশ টাকা

সর্বজনের স্বাস্থ্য এবং করোনা মোকাবিলায় গণবিরোধী ফ্যাসিবাদী সরকার ব্যর্থ

অধিকার প্রতিষ্ঠায় গণআন্দোলন গড়ে তুলুন-স্বাস্থ্য কনভেনশনে বাম গণতান্ত্রিক জোট

বাম গণতান্ত্রিক জোটের উদ্যোগে ১৭ ডিসেম্বর '২০ সকাল সাড়ে ১০টায় 'করোনা অতিমারি : সর্বজনের স্বাস্থ্য'বিষয়ক কনভেনশন মুক্তি ভবনের মৈত্রী মিলনায়তনে জোট সমন্বয়ক ও সিপিবি'র প্রেসিডিয়াম সদস্য আবদুল্লাহ ক্বাফী রতনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

কনভেনশনে বিশেষজ্ঞ বক্তব্য রাখেন ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী, অধ্যাপক ডা. রশীদ-ই-মাহাবুব, অধ্যাপক ডা. আবু সাঈদ, অধ্যাপক হারুন অর রশীদ, অধ্যাপক ডা. শাকিল আখতার, ডা. মাহফুজুর রহমান, অধ্যাপক ডা. লিয়াকত আলী, ডা. মুশতাক হোসেন, অধ্যাপক ডা. কাজী রকিবুল ইসলাম, ডা. লেলিন চৌধুরী, যুক্তরাজ্য প্রবাসী ডা. রফিকুল হাসান জিন্নাহ, ডা. মনীষা চক্রবর্তী, অনুজীব বিজ্ঞানী ডা. রুবায়েৎ হাসান তানভীর, অভিনু কিবরিয়া ইসলাম। উপস্থিত ছিলেন, অধ্যাপক ডা. রওশন আরা, অধ্যাপক ডা. ফজলুর রহমান।

কনভেনশনে আরও বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান, সিপিবি'র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মো. শাহ আলম, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড সাইফুল হক, বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি, বাসদ (মার্কসবাদী)'র মানস নন্দী, ইউসিএলবি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সভাপতি হামিদুল হক, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির শহিদুল ইসলাম সবুজ, ওয়ার্কার্স পার্টি (মার্কসবাদী)'র হাবিব বসুনিয়া।

উপস্থিত ছিলেন সিপিবি'র সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড সাজ্জাদ জহির চন্দন, বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, ইউসিএলবি'র সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন নান্নু, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, ওয়ার্কার্স পার্টি (মার্কসবাদী)'র সাধারণ সম্পাদক ইকবাল কবির জাহিদ, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য আকবর খান, গণসংহতি আন্দোলনের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বাচ্চু ভূঁইয়া।

নেতৃবৃন্দ বলেন, করোনা অতিমারিতে বাংলাদেশসহ বিশ্বের ২১৮টি দেশ ও অঞ্চল আক্রান্ত। বাংলাদেশে ৮ মার্চ প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয় এবং ১৮ মার্চ প্রথম মৃত্যু ঘটে। পরবর্তীতে তা মহামারি আকারে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। সরকার এই মহামারি মোকাবিলায় শুরু থেকেই

উদাসীনতা দেখিয়েছে, যে কারণে জনস্বাস্থ্য রক্ষায় কার্যকর উদ্যোগ নিতে ব্যর্থ হয়েছে। করোনা শনাক্তে পরীক্ষাকেন্দ্র দেশের সবগুলো জেলায়ও স্থাপন করতে পারেনি। তাই ব্যাপক মানুষ করোনা সনাক্তের বাইরে থেকে গেছে এবং আক্রান্ত ব্যক্তি তা ব্যাপকভাবে অন্যদের মধ্যে ভাইরাস ছড়িয়েছে। সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কোনো ধরনের যাছাই-বাছাই ছাড়া করোনা টেস্টের জন্য নিম্নমানের হাসপাতাল ও প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দিয়েছে। সেই প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালগুলো পরীক্ষা না করে ভুয়া রিপোর্ট, সার্টিফিকেট দিয়েছে। যা স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়িয়েছে, মৃত্যুর কারণ হয়েছে। এসময় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা ব্যাপক দুর্নীতি-অনিয়ম করে কোটি কোটি টাকা লুটপাট করেছে। সরকার এর দায় নেয়নি।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী, মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের চরম ব্যর্থতাকে প্রধানমন্ত্রী সফলতার সার্টিফিকেট দিয়ে দায়মুক্ত করেছে। লকডাউন দিয়ে তার দায় না নিয়ে তাকে সাধারণ ছুটি নাম দিয়ে পার পাওয়ার চেষ্টা করেছে। যার কারণে গরিব মানুষ কাজ হারিয়ে নিদারুণ অর্থকষ্টে পড়েছে। আর সরকার এর জন্য নামমাত্র সহায়তামূলক পদক্ষেপ নিয়েছে তাও জনগণের কাছে না পৌঁছে আওয়ামী লীগ দলীয় কর্মীরা লুটপাট করে নিয়েছে।

কনভেনশনে বলা হয়, জনস্বাস্থ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে করোনা মোকাবেলায় ব্যর্থ গণবিরোধী ফ্যাসিবাদী সরকার উচ্ছেদের বিকল্প নাই।

কনভেনশন থেকে টেস্টবৈরী পরিবেশের পরিবর্তে টেস্টবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করে প্রতিদিন

বিনামূল্যে কমপক্ষে এক লাখ টেস্ট করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে সরকারের প্রতি দাবি জানানো হয়। কনভেনশনে মাস্ক পরিধান ও শারীরিক দূরত্ব বাজায় রাখা জন্য ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করতে সরকারের প্রতি দাবি জানানো হয়।

কনভেনশনে করোনা ভ্যাকসিন নিয়ে যে কোন ব্যবসায়িক অপচেষ্টা রুখে দিয়ে বিনামূল্যে দেশের সকল মানুষকে করোনা ভ্যাকসিন সরবরাহ করতে হবে। কনভেনশনে বলা হয়, 'সকলের জন্য স্বাস্থ্য' মডেল নির্মাণ করতে হবে যাতে সর্বজনের স্বাস্থ্য নিশ্চিত হয়। কনভেনশনে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্য প্রশাসন পুনর্বিন্যাস করার দাবি জানানো হয়।

কনভেনশনে নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, দেশে করোনা সংক্রমণের শুরুতে তা মোকাবিলায় সরকার পর্যাপ্ত প্রস্তুতির সময় পেয়েছিল কিন্তু সেটাকে কাজে লাগায়নি। পরবর্তীতে সংক্রমণকালে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমে স্বাস্থ্য খাতে কোনো সমন্বয় ও তদারকি জবাবদিহিতা, নিয়ন্ত্রণ ছিল না। চিকিৎসা ও সুরক্ষাসামগ্রী ক্রয়, নমুনা পরীক্ষা, চিকিৎসাসেবা, ত্রাণ বিতরণে দুর্নীতিসহ বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতির চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। শুধু তাই নয়, এসব তথ্য প্রকাশে বিধিনিষেধ আরোপের মাধ্যমেও অনিয়ম-দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনাকে আড়াল করার চেষ্টা করেছে। দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের চেয়ে সরকার বেশি তৎপর ছিল তথ্যের প্রকাশ নিয়ন্ত্রণে।

দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের নামে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভাগীয় পদক্ষেপের অংশ হিসেবে শুধু বদলি ও ওএসডি-নির্ভর একধরনের আনুষ্ঠানিকতা দেখিয়েছে। এটা ছিল মূলত, জনগণকে ধোঁকা দেয়া ও দুর্নীতিকে আড়াল করার কৌশল। কিন্তু দুর্নীতিবাজদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির কোনো নজির দেখা যায়নি। দুদকও এখাত নিয়ে সক্রিয়তার পরিচয় দেয়নি। ফলে, সামনের সারির দু-চার জন ছাড়া দুর্নীতির সাথে যুক্ত রুই-কাতলারা ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে। এমনকি এ সময় স্বাস্থ্যবিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি একটি বৈঠকও করেনি।

সরকার রাজনৈতিক দল, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সামাজিক শক্তিকে যুক্ত করে যথাযথভাবে করোনা মোকাবিলার বদলে এ সংক্রান্ত কার্যক্রম নিজ নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যাপারে ছিল অধিক তৎপর। এর মাধ্যমে রাজনৈতিক সাফল্যের দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখাতে চেয়েছে, বাস্তবে ব্যর্থতাই প্রকাশ পেয়েছে। ফলে, তথ্য ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এবং জনগণের মধ্যে চিকিৎসা পাওয়া নিয়ে ব্যাপক অনিশ্চয়তা ও অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। দেশের চিকিৎসাসেবায় বিশেষজ্ঞদের কোন মতামত গ্রহণ করেনি। মানুষের যখন অর্থনৈতিক সক্ষমতা ভেঙে পড়েছে তখন বিনামূল্যে নমুনা পরীক্ষার সুবিধা প্রত্যাহার করে সরকার পরীক্ষার ক্ষেত্রে ফি আরোপ করায় মানুষ পরীক্ষা করানোর আগ্রহ হারিয়ে, কমিয়ে দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যকর্মীদের যথাযথ মানের সুরক্ষাসামগ্রী ও নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় অনেক চিকিৎসকসহ স্বাস্থ্যকর্মীর অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু ঘটেছে। বেসরকারি হাসপাতালগুলোকে করোনা চিকিৎসাসেবা দিতে সরকার কার্যকর ভূমিকা নিতে পারেনি। সরকারি হাসপাতালগুলেতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন সরবরাহ, আইসিইউ, ভেন্টিলেটর ইত্যাদি প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সহায়ক সামগ্রী নিশ্চিত করতে পারেনি। এর ফলে রোগী ও তাদের পরিবার পরিজনকে সীমাহীন ভোগান্তিতে পড়তে হয়েছে। এখনও এবিষয়গুলোকে গুরুত্বসহকারে সরকার নেয়নি। করোনায় সবচেয়ে অসহায় অবস্থায় পড়েছে দেশের শ্রমজীবী দরিদ্র জনগোষ্ঠী। এখনও তারা চিকিৎসার বাইরে আছে।

করোনা সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশে এখনও বিধি-নিষেধ বহাল আছে। সরকারি ক্রয়, করোনা সংক্রমণের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ, ত্রাণ ও প্রণোদনা বরাদ্দ, বিতরণ ইত্যাদি বিষয়ে অবাধ তথ্য প্রবাহ গণমাধ্যমসহ দেশের মানুষকে জানতে দেয়া হচ্ছে না। যার কারণে মানুষ তাদের অধিকার বঞ্চিত হচ্ছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন এখনও খড়্গ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, মানুষ হয়রানির শিকার হচ্ছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, এখনও পরীক্ষাগার ও নমুনা পরীক্ষা সম্প্রসারণে ঘাটতি আছে। বিরাজ করছে পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়নে ঘাটতি, চিকিৎসা ব্যবস্থায় সক্ষমতার ঘাটতি, ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশে ঘাটতি, সরকারি ক্রয়ে দুর্নীতি, নমুনা পরীক্ষায় দুর্নীতি এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে দুর্নীতি। এছাড়া করোনা মোকাবিলায় স্বাস্থ্য খাতে বিদেশি অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পসহ বিভিন্ন জিনিস ক্রয়ে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট

বিধিমালা (পিপিআর) ২০০৮ যথাযথ অনুসরণ করা হয়নি। বাস্তবে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য খাত চরম অব্যবস্থাপনা, অনিয়মের মধ্যদিয়ে চলছে এবং চরমভাবে দুর্নীতি, লুটপাটে আকণ্ঠ নিমজ্জিত।

কমরেড খালেকুজ্জামান বলেন, আজকের স্বাস্থ্যবিষয়ক কনভেনশনে দেশের এবং দেশের বাইরে থেকেও বিশেষজ্ঞ যারা বক্তব্য রেখেছেন তারা বহু বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন, অনেক ধরনের সংগতি-অসঙ্গতি এবং অব্যবস্থাপনার দিকগুলো তুলে এনেছেন। দেশে অতিমারিতে ও সাধারণ অবস্থায় স্বাস্থ্যব্যবস্থা কী হীন অবস্থায় আছে এবং তা প্রতিরোধে যে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে শাসক সরকার তা দেশবাসীর সামনে উঠে এসেছে। এটা প্রতিকারের নানা পর্যায়ে অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি এবং লুকিয়ে রাখা সত্য, দায়সারা গোছের দায়িত্ব পালনের পরাকাষ্ঠার একটা বিশদ ছবি ওনারা তুলে ধরেছেন। আমাদের গোটা স্বাস্থ্যব্যবস্থার বেহাল দশা নিয়ে বিশদ আলোচনা এবং করণীয় কর্তব্য কী সেগুলো নিয়েও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সময় উপযোগী বক্তব্য হাজির করেছেন। ফলে, এখানে যে সার্বজনীন স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতি কতটা প্রয়োজনীয় সেগুলো সামনে এসেছে। মহামারি মোকাবিলায় প্রতিরোধমূলক ও নিরাময়ে আমাদের গবেষণাব্যবস্থা সাংঘাতিকভাবে অবহেলিত। আর নিরাময়ব্যবস্থার ত্রুটিগুলো সামনে এসেছে।

জনসাধারণ, শ্রমজীবী মানুষ ও দরিদ্রমানুষ যে কীভাবে বঞ্চিত হচ্ছে এবং সাধারণভাবে গোটা স্বাস্থ্যব্যবস্থা যে কী রকম দুর্বল ও দুর্নীতির মধ্যে আছে, সেটাকে যেভাবে গুরুত্বহীন করে ফেলা হয়েছে, এগুলোর ব্যাপারে শাসকদের চরম উপলব্ধির ঘাটতি রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, দেশের নাগরিকদের মৌলিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় যাদেরকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, তাদের উপলব্ধির জায়গাটা হচ্ছে ব্যক্তিস্বার্থ। অর্থাৎ তাদের জনসেবার মনোভাব অনুপস্থিত। আলোচনায় উঠে আসা বক্তব্যগুলি আমরা জোটের পক্ষ থেকে দেশের মানুষের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করবো। জনস্বাস্থ্য আন্দোলন গড়ে তোলা, জনগণের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলা দরকার। এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মতামতগুলো দেশের সাধারণ মানুষের কাছে ব্যাপকভাবে নিয়ে যেতে পারলে আন্দোলনের একটা ভিত রচিত হবে এবং আন্দোলন শক্তিশালী হবে।

ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী : আমরা বলি আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন আনতে হবে কিন্তু কীভাবে সেটা হবে তা নিয়ে পর্যাপ্ত আলোচনা হয় না। মহামারিতে সবচেয়ে বড় ব্যবসা হয়েছে আইসিইউ ব্যবসা। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলছেন, একটা আইসিইউ-তে সরকারের ব্যয় হয় ৪ লাখ টাকা। কিন্তু এটা কোন হাসপাতালের কত দিনের ব্যয় তা অবশ্য বলেননি। আর যে রোগী চিকিৎসা নিতে আসেন অন্যান্য খরচ মিলে তার ব্যয় কত সে হিসাবটা নেয়া দরকার। সরকারি হাসপাতালগুলোতে তো ওষুধ দেয়া হয় না, সেখানে রোগীর আত্মীয়-স্বজনের হাতে একটা চিরকুট ধরিয়ে দেয়া হয়। হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে এসে রোগী ও তার পরিবার সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। একটা ইউনিয়নে যদি গড়ে ৫০ হাজার মানুষ বসবাস করে তাদের জন্য একজন রেজিস্ট্রাড এমবিবিএস ডাক্তার নেই। প্রধানমন্ত্রীকে বার বার বলার কারণে তিনি উদ্যোগ নিলেন। এব্যাপারে প্রজ্ঞাপন জারি হলো আবার দুই সপ্তাহ পরে সেটা প্রত্যাহার করা হলো। পরিবর্তণ আনতে হবে মেডিকেল কলেজের শিক্ষায়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সবকিছুই পণ্য কিন্তু স্বাস্থ্য সেবা, চিকিৎসা, শিক্ষা পণ্য হতে পারে না। সরকারকে ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর বাণিজ্য উপদেষ্টা সালমান রহমান খালেদা জিয়ার সাথে পরামর্শ করে ১৯৯৪ সালে ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করে। এখন ১১৭টা ওষুধ ছাড়া বাকি ওষুধের মূল্য কোম্পানি নির্ধারণ করে। এখন চিকিৎসকরা অপ্রয়োজনীয় ওষুধ দেয় এটার অডিট করার ব্যবস্থা থাকা দরকার। পাশ্চাত্যে হাসপাতালে একজন রোগীর মৃত্যু হলে তার ফাইল চলে যাবে হাসপাতাল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। তিনি দেখবেন কোন ভুল হয়েছে কিনা। যদি একটা হাসপাতালে ৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হয় তাতে প্রায় সব ধরনের অপারেশন করানো যাবে ৫০ রকমের প্যাথলজিক্যাল টেস্ট করানো যাবে। মেডিকেল ছাত্রদের এক মাস ইউনিয়ন পর্যায়ে থাকতে হবে। ডাক্তাররা জনগণের পয়সায় লেখাপড়া করে আর জনগণকে সেবা দিবে না এটা হতে পারে না। আজকে পরিবর্তণ আনতে হবে প্রশাসনে। বামপন্থীদের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চিকিৎসা ব্যবস্থা দেখে তার নিরিখে সুস্পষ্ট প্রস্তাব নিয়ে আন্দোলনের মাঠে নামতে হবে।

অধ্যাপক ডা. রশীদ-ই মাহবুব বলেন, প্রথম কথাটা হচ্ছে স্বাস্থ্যটা কার? জনগণের। জনগণের স্বাস্থ্য-চিকিৎসা দেখার দায়িত্ব সরকারের। রাজনীতির কাজ হলো জনগণের অধিকার নিশ্চিত করা। আমাদের দেশে স্বাস্থ্য-চিকিৎসা নিয়ে কোন রাজনৈতিক দলের তেমন কোন আন্দোলন দেখিনি। সর্বজনীন স্বাস্থ্য-চিকিৎসা হলো সবার জন্য চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার উন্মুক্ত করা। এর জন্য একটা উপযুক্ত পরিকল্পনা দরকার। চিকিৎসা যেহেতু মানুষের অতিপ্রয়োজনীয় বিষয় এই জন্য তারা প্রত্যাশা করে রাজনৈতিক দলগুলো এটা নিয়ে কথা বলুক। আমাদের মতো অর্থনৈতিক সঙ্গতিপূর্ণ দেশ গুরুত্ব দিবে কী সে? দিবে জনস্বাস্থ্য কিন্তু সেটা দেয়া হচ্ছে না। বাস্তবে দেশে জনস্বাস্থ্য বলতে কিছু নেই, সেটা ভাগবাটোয়ারা করে খেয়ে ফেলেছে। জনস্বাস্থ্যে কোন বিশেষজ্ঞ কমিটি নেই যারা এ ব্যাপারে নির্দেশ দিতে পারে। যেমন, আমাদের খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টা কে দেখবে? বাংলাদেশে কোন জনস্বাস্থ্য বিভাগ নেই আছে স্বাস্থ্য বিভাগ। এই বিষয়গুলো রাজনৈতিক দলগুলোর দেখার কথা, ডাক্তাররা এ ব্যাপারে কিছু করতে পারবে না। আমাদের প্রথমিক চিকিৎসা সেবার যারা কাজ করেন তাদের চেয়ে ফার্মেসির লোকজন ভালো জানে। চিকিৎসা বিভাগে চলছে অরাজকতা। এটাকে পুঁজি করে চিকিৎসক সমাজকে ধাক্কা দিয়ে একটা জায়গায় ফেলে দেয়া হয়েছে। তারা

অতিলোভী, অর্থলোভী প্রাইভেটে রোগী দেখে। রাষ্ট্র কেন প্রাইভেটে রোগী দেখতে দেয়। আজ পর্যন্ত কেন একটা প্রতিষ্ঠান করা গেল না যারা প্রাইভেট রোগী দেখবে না? এগুলোর দিকে নজর না দিলে জনগণ স্বাস্থ্য-চিকিৎসা সেবা পাবে না।

অধ্যাপক ডাক্তার আবু সাঈদ বলেন, স্থানীয় সরকারগুলোকে যদি স্বায়ত্তশাসন না দেয়া হয়, শক্তিশালী করা না হয় তা হলে স্বাস্থ্য সেবা জনগণের দোরগোড়ায় যাবে না।

অধ্যাপক ডাক্তার হারুন অর রশীদ বলেন, আমাদের সরকার বলছে আমরা করোনাকে ভালোভাবে মোকাবিলার করার কারণে আমাদের মৃত্যুহার কম। কথাটা সঠিক নয়। কারণ আমরাতো ইটালি, স্পেন, ইংল্যান্ড, ফ্রন্সের চেয়ে ভালো চিকিৎসা, ব্যবস্থাপনা দিচ্ছি না। করোনার শুরুতে সরকার বলছে তারা সেটা মোকাবিলায় প্রস্তুত পরে দেখাগেল সবকিছু লেজেগোবরে অবস্থা। সরকার করোনায় একদল লুটপাটকারীকে তাদের কাজ সফলভাবে করার জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছে এটা সে যথেষ্ট সাফল্যের সাথে করতে পেরেছে। তাইওয়ানের স্বাস্থ্যকর্মীরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে মানুষকে মাস্ক দিয়েছে আমাদের সরকার কী করেছে। সরকার যদি ওষুধ না দেয় তা হলে জনগণের সামর্থ নেই ওষুধ কিনে চিকিৎসা নেয়ার। আমাদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোন ইউনিফর্মেটি নেই। করোনা রোগী যারা প্রাইভেট হাসপাতালে যায় কোন রোগী ৩ থেকে ৫ লাখ টাকার কম খরচে বেরিয়ে আসতে পারে না। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কোন সংকটাপন্ন রোগী যে ভেন্টিলেটরে সাপোর্টে থাকে কিন্তু বাঁচার সম্ভাবনা নেই তার ক্ষেত্রে হাসপাতালের ৩ জন সিনিয়ন ডাক্তার যদি সাপোর্ট খুলে দিতে বলেন, সেটা যথেষ্ট। কিন্তু আমাদের দেশে শুধু শুধু সে রোগীকে হাসপাতালে রেখে দিয়ে টাকা কামায়। এর চেয়ে নিকৃষ্ট মানসিকতা আর কী হতে পারে। এটা একটা মাফিয়া চক্র। সরকার সব প্রতিষ্ঠান খুলে দিয়েছে কিন্তু স্কুল কেন বন্ধ করে রেখেছেন। দেশের এতগুলো বিশ্ববিদ্যালয় সরকার কেনো করোনায় এগুলোকে গবেষণায় ব্যবহার করলো না। বলা হচ্ছে গরিব মানুষের করোনা হয় না। এটা বাজে কথা। কাউকে টেস্ট না করে এ কথা বলা যাবে না। এর মানে হচ্ছে গরিব মানুষকে ভেকসিন দেয়া হবে না, তাদের ঠকানো হবে।

অধ্যাপক ডা. সাকিল আক্তার বলেন, স্বাস্থ্য খাতে এত বেশি খরচ হয় যে জনগণের পক্ষে তা বহণ করা সম্ভব হয় না। চিকিৎসা খাতে বাজেট কমিয়ে দেওয়ার মধ্যদিয়ে সরকার তার দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছে। আমাদের স্বাস্থ্য-চিকিৎসা সেবা ব্যবস্থা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। এ অধিকার নিয়ে গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

ডাক্তার মাহফুজুর রহমান বলেন, আমাদের প্রত্যেক উপজেলায় হেল্‌থ কমপ্লেক্স আছে, ১২-১৩টা বিভাগে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। ১০-১২টা উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে, ৩টা কমিউনিটি ক্লিনিক আছে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অবকাঠামো শক্তিশালী কিন্তু অচল। আমাদের প্রশাসনকে জনমুখী হতে হবে এখন জনগণ প্রশাসনমুখী। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর-মন্ত্রণালয় একটা দুঃসহনীয় অব্যবস্থার মধ্যদিয়ে চলছে।

ডাক্তার লিয়াকত আলী বলেন, করোনা আমাদেরকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে, স্বাস্থ্য মানে শুধুই মেডিকেল ব্যবস্থা না। স্বাস্থ্যের রয়েছে একটি রাজনৈতিক দিক, একটি অর্থনৈতিক দিক, একটি সামাজিক দিক। স্বাস্থ্য যে সমগ্র উন্নয়নের অংশ তা আমরা যারা চিকিৎসা পেশায় যুক্ত তারা মুখে বলে এসেছি, কিন্তু নীতিনির্ধারকদের কাছে এবং জনগণের কাছে এ বিষয়টি সবসময় স্পষ্ট ছিল না। এখন স্বাস্থ্যের কারণে যখন উন্নয়ন বন্ধ রয়েছে, শিক্ষা বন্ধ রয়েছে জীবন জীবিকা বন্ধ রয়েছে তখনই আমরা এর গুরুত্ব বুঝতে পারছি। শুধু স্বাস্থ্যব্যবস্থার-ই
নয়, পুরো রাষ্ট্র ব্যবস্থার একটি টেস্ট দরকার। বিগত ১০ বছরে স্বাস্থ্যব্যবস্থা আরও স্থবির হয়ে পড়েছে।

মহামারি আসছে-যাচ্ছে শুধু এই মহামারি পার হয়ে গেলে আমরা বেঁচে গেলাম ব্যপারটা কিন্তু কখনই এমন না। মৃত্যুর সংখ্যা দেখে আমরা আত্মসন্তুষ্টিতে ভুগতে পারি, কিন্তু শুধু মৃত্যুহারই একমাত্র বিবেচ্য বিষয় না। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা
যে ধ্বংস হচ্ছে, শিশুদের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ধ্বংস হচ্ছে, আমাদের অর্থনীতি ধ্বংস হচ্ছে এগুলো সব তথ্যকে আমাদের বিবেচনায় নিয়ে আসতে হবে। আমাদের ক্রনিক ডিজিজে যারা ভুগছেন তাদের স্বাস্থ্যের অবনতি হচ্ছে। সে জন্য আমাদের সতর্কভাবে এগুতে হবে।

ডাক্তার মুশতাক হোসেন বলেন, জনস্বাস্থ্যের আদলে আমাদের চিকিৎসাব্যবস্থা সাজাতে হবে। আমাদের জনসংখ্যার তুলনায় হাসপাতালের বেড, চিকিৎসক ও নার্সের সংখ্যা অনেক কম। আমরা যদি রোগ প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন কার্যক্রম না করি তা হলে আমরা হাসপাতাল ও আইসিইউ বাড়িয়েও মানুষকে বাঁচাতে পারবেন না। আমাদের ডোর টু ডোর স্বাস্থ্য কার্যক্রম চালাতে হবে। ওষুধ চিকিৎসাব্যবস্থার একটা অংশমাত্র। জনস্বাস্থ্যের অনেকগুলো ইনস্টিটিউট দরকার। চিকিৎসাব্যবস্থাকে ক্যাডার সার্ভিস থেকে আলাদা করে স্বায়ত্তশাসিত করে দেয়া দরকার। স্বাস্থ্যটাকে রাজনৈতিক বিষয়ে পরিণত করতে হবে। চিকিৎসাব্যবস্থাকে প্রাইভেট হাসপাতালের ওপর ছেড়ে দেয়া যাবে না। যে দেশের পাবলিক হেল্‌থ ব্যবস্থা ভালো তারা করোনাকে সাফল্যের সাথে মোকাবিলা করতে পেরেছে। করোনার টিকা আবিষ্কারে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে আছে চীন-রাশিয়া তার সংবাদ প্রচার মাধ্যমে নেই প্রচারে আছে ব্রিটেনের টিকার কথা। চীন আমাদের ২০০ আরটিপিসিআর টেস্টের মেশিন ফ্রি দিতে চেয়েছিল, টিকা ফ্রি দিতে চেয়েছিল কেন নেয়া হয়নি তা আমি জানি না। টিকা আমাদের শতভাগ নিরাপত্তা দিবে না। আমাদের স্বাস্থ্যবিধি মানতে হবে। ডাক্তার মনীষার নেতৃত্বে বাসদ করোনা কালে বরিশালে যা করেছে এটা আমাদের একটা করণীয় কার্যক্রমের মডেল হতে পারে।

প্রফেসর কাজী রকিবুল ইসলাম বলেন, স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা ধনী-গরিব প্রত্যেক নাগরিকেরই প্রয়োজন। আমরা যে রকম স্বাস্থ্যব্যবস্থা চাই, তা যে ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা দিতে পারে আমাদের সে রকম রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দেশের চিকিৎসাব্যবস্থা উন্নতি না করে বিদেশে গিয়ে

চিকিৎসা পাওয়া কারোও পক্ষেই সম্ভব নয়। সেটা এরকম মহামারিকালে তো নয়-ই। যারা সর্দি-কাশি হলেও বিদেশে চলে যেতেন করোনাকালে তাদের পক্ষে সেটা সম্ভব হচ্ছে না। স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে হবে, ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে। যারা স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসার সাথে জড়িত তাদের মানবিক হতে হবে। করোনাকালে যে দুর্নীতি ও লুটপাটের বিষয় উন্মোচিত হয়েছে তাদের বিচারের আওতায় আনতে হবে। দ্রুত করোনা পরীক্ষার কিট তৈরি করে ভিয়েতনাম ও কোরিয়া দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তারা নিজ দেশের চাহিদা পূরণ করে বিদেশেও রপ্তানি করেছে।

ডা. লেনিন চৌধুরী বলেন, করোনা অথবা এই জাতীয় মহামারি প্রতিরোধের দুটো পথ। একটি হচ্ছে প্রতিরোধমূলক, অন্যটি হল নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম। এ জাতীয় মহামারির ক্ষেত্রে কতগুলো মৌলিক নিয়ম রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে মানব অধিকারের প্রথম শর্ত 'রাইট টু লাইফ' জীবনের অধিকার, মানে বাঁচার অধিকার; এটাকে প্রতিষ্ঠার জন্য সমস্ত কিছুর ওপরে বিজ্ঞান। এ দুটি বিষয়কে সামনে রেখে বৈশ্বিক মহামারি বা দেশে মহামারি মোকাবিলায় মানবাধিকারের যে ঘোষণা তার সাথে সংগতিপূর্ণ। প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সংক্রামক ব্যাধির জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম হচ্ছে, যারা রোগী অথবা রোগ বয়ে আনতে পারে সম্ভাব্য এমন সবাইকে দেশে প্রবেশের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপ করা। যদি তারা দেশে চলে আসে তাদেরকে আলাদা রাখতে হবে। ইটালি থেকে যারা ফিরলো, তাদের আবশ্যিক কোয়ারেন্টাইনে রাখার কথা কিন্তু তাদেরকে পাঠিয়ে দেয়া হলো বাড়িতে। হোম কোয়ারেন্টাইনের নাম করে তারা ঘুরে বেড়িয়েছে, পিকনিক করেছে, বিয়ে করেছে ইত্যাদি।

তার মানে মহামারি প্রতিরোধের প্রথম শর্তটিতে আমরা সফল হলাম না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই মহামারি প্রতিরোধে প্রথম শব্দটি বলেছে, মানুষজনকে সম্পৃক্ত করা। অর্থাৎ মানুষজনকে সম্পৃক্ত করে একটি কার্যকরী প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যা আজ পর্যন্ত আমাদের চোখে পড়েনি। রোগী হিসেবে সন্দেহ জনকে পরীক্ষা করব, তারপর ফলাফল অনুযায়ী ব্যবস্থা নেব। যখন দেশে করোনা আতঙ্ক তুঙ্গে, মানুষজন পরীক্ষার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে; তখন অদ্ভুতভাবে সর্বজন গ্রাহ্য বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি, টেস্ট আরো টেস্ট এটাকে থামিয়ে দেয়ার জন্য টেস্ট প্রতি ২০০ টাকা ফি ধার্য করা হলো। শুধু তাই নয় রোগীর সংখ্যা কমানোর জন্য চারটি উপসর্গ ব্যতীত টেস্ট বন্ধ করে দেওয়া হল। বিভিন্ন শর্ত আরোপ করে টেস্ট সংকোচনের নীতি গ্রহণ করল। এ সিদ্ধান্ত জনস্বাস্থ্যের স্বার্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না।

এর পরে পরীক্ষা বাড়ানোর আর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হলো না। স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ জনগণের সাথে প্রহসন করেছে। মাত্র ২০০০ টেস্ট কিট নিয়ে ১৭ কোটি মানুষের একটি দেশে বলেছিল তারা করোনা প্রতিরোধে পুরোপুরি তৈরি। এই বিষয়টির জবাবদিহিতা হওয়া উচিত।

করোনার ধাক্কাতে দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রকৃত চিত্র উঠে এসেছে। অর্থাৎ জনস্বাস্থ্যের সাথে সম্পর্কিত যেকোন ব্যাধি মোকাবিলায় সামর্থ্য আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের নেই। যেমন, ঢাকা শহরের বেশ কিছু অঞ্চলকে রেড জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল এবং সেখানে স্থানীয় ভিত্তিতে লকডাউন ঘোষণা করে সেখানে পরীক্ষা অভিযান চালু করে রোগী শনাক্ত করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়ার জন্য। ঢাকার মাত্র দুটো জায়গায় এটি বাস্তবায়ন করা হয়েছিল আর কোথাও করা হয়নি। অর্থাৎ সিদ্ধান্ত হয়েছিল বাস্তবায়ন করতে পারেনি। আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বা বিভাগকে দিয়ে ১৭ কোটি মানুষের দেশে স্বাস্থ্য সেবা দেওয়া সম্ভব নয়। এর একটি পুনর্বিন্যাস বা সংস্কার করতে হবে।

সংস্কার কীভাবে হবে? আমার প্রস্তাবনায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হোক। ১. জনস্বাস্থ্য বিভাগ, তার একটি সচিব থাকবে; ২. চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা ও চিকিৎসা শিক্ষা; ৩. চিকিৎসায় গবেষণা; ৪. সমন্বয় বিভাগ ৫. পরিবার কল্যাণ বা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ।

আমাদের অভিজ্ঞতায় মনে করি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব একজন স্বাস্থ্য বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে দেওয়া উচিত, যা পৃথিবীর অনেক দেশেই রয়েছে। বাংলাদেশের সরকারি-বেসরকারি মিলে ১১০টির মতো মেডিকেল কলেজ রয়েছে। তাদের সবার ভাইরোলজি ডিপার্টমেন্ট রয়েছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারের অধীনে বেশ কয়েকটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, করোনাকালে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান ন্যূনতম কোন গবেষণা নিয়ে সামনে আসেনি। আমাদের চিকিৎসা পেশার সাথে যুক্ত যে মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের এই ভয়ংকর নিষ্ক্রিয়তা আমাদেরকে আতঙ্কিত করেছে। চিকিৎসা নিয়ে গবেষণায় জোর দিতে হবে এবং জাতীয়ভাবে একে পৃষ্ঠপোষকতা করতে হবে।

দেখা গেছে দেশে করোনা প্রতিরোধের থেকেও চিকিৎসার দিকে গুরুত্ব বেশি দিয়েছি। আগে থেকেই আমরা বলে আসছিলাম, বাংলাদেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় মূলত একটি চিকিৎসা মন্ত্রণালয়। কিন্তু আমরা জানি স্বাস্থ্য মানে কিন্তু শুধু রোগের চিকিৎসা না এটি একটি অংশমাত্র। কিন্তু পুরো স্বাস্থ্য বিভাগটা চিকিৎসার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশে গত ১২-১৩ বছর যাবৎ জাতীয় বাজেটের মাত্র ০.৯ ভাগের আশেপাশে মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য বরাদ্দ হয়েছে। এই বরাদ্দও পুরোটা কাজে লাগানোর মতো সামর্থ্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নেই। প্রতি বছর বেশ কিছু পরিমাণ অর্থ ফেরত যায়। যেখানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সুপারিশ করেছে আমাদের মতো দেশগুলোতে স্বাস্থ্য সেবায় জাতীয় বাজেটের ৫ শতাংশ স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ দেওয়া দরকার, সেখানে বরাদ্দ হচ্ছে মাত্র ০.৯ শতাংশ। আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিস্তৃতি-আকার বাড়াতে হবে এবং ১৭ কোটি মানুষের স্বাস্থ্য সেবা দেওয়ার জন্য উপযুক্ত বিন্যাসে বিন্যস্ত করতে হবে।

ডা. রফিকুল হাসান জিন্না বলেন, ব্রিটেনে কৃষ্ণাঙ্গ এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মানুষের কারোনায় আক্রান্ত এবং মৃত্যু হার বেশি। ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকায় একই চিত্র। করোনার শুরুতে আমি বাংলাদেশে ছিলাম তখন অবাক হয়ে দেখেছি এব্যাপারে সরকার ও স্বাস্থ্য বিভাগের কোন

তৎপরতা লক্ষ্য করিনি। হার্ড ইমিউনিটি নামের একটা পথ অবলম্বনের কথা বলা হচ্ছে। করোনা মোকাবিলায় হার্ড ইমিউনিটি কীভাবে কাজ করবে? এক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে, যারা একবার ভাইরাসটিতে আক্রান্ত হয়, তাদের মধ্যে ওই ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী হয়। এভাবে বেশি মানুষ ভাইরাসে আক্রান্ত হতে থাকলে এক সময় বড় সংখ্যক মানুষের মধ্যে ভাইরাসের প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। যার কারণে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি সুরক্ষা বলয় তৈরি হয় এবং ওই রোগটির সংক্রমণ থেমে যায়। বাস্তবে এর মাধ্যমে করোনা বেশি ছড়াবে।
ডা. মনিষা চক্রবর্তী বলেন, বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের শুরু থেকে পরিস্থিতি মোকাবিলায় আমরা জনগণের পাশে থেকে সাধ্যানুযায়ী নানা ধরনের কাজ করেছি। বরিশাল বিভাগে করোনা পরীক্ষার কোন ল্যাব ছিল না। মে মাস থেকে সেখানে পিসিআর ল্যাবে করোনা পরীক্ষা শুরু হয়। কিন্তু দক্ষ জনবলের ঘাটতির কারণে এটা দৈন্যদশা অবস্থায় চলছে। শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজে একটা করোনা ইউনিট খোলা হয়েছে কিন্তু চিকিৎসা উপকরণের ঘাটতি আছে। যেমন, সিনিয়র ডাক্তাররা যে প্রতিদিন হাসপাতালে রোগীকে দেখবেন তা হচ্ছে না; যতটুকু হচ্ছে তাও দায়সারা ধরনের। আইসিইউতে ১৫টা বেড আর মাত্র একজন কনসালটেন্ট। জটিল রোগীর জন্য অপরিহার্য আক্সিজেনের প্রেসার ব্যবস্থাপনাও ত্রুটিপূর্ণ। বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষ থেকে এয়ার এ্যাম্বুলেন্সের বিভিন্ন সংস্থাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, কোন এয়ার এ্যাম্বুলেন্স সাধারণ করোনা রোগীকে বহণ করতে পারবে না। শুধুমাত্র স্বাস্থ্য বিভাগের ডিজি'র অনুমতিতে ভিআইপি করোনা রোগীকে এয়ার এ্যাম্বুলেন্সে বহন করা যাবে। একজন মুক্তিযোদ্ধা ভিআইপির তালিকায় স্থান পাননি। স্বাধীন দেশে এর চেয়ে লজ্জার আর কী আছে। চিকিৎসা সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রেও দলীয়করণের প্রধান্য চলছে। এর বাইরে কয়েকটি জেলায় আইসোলেশন সেন্টারের মতো কিছু সেন্টারে করোনা রোগীর চিকিৎসা দেয়া হয়।
বাসদের পক্ষ থেকে করোনা রোগীদের জন্য এ্যাম্বুলেন্স, অক্সিজেন ব্যাংক, ফ্রি মাস্ক বিতরণ সেবা পরিচালনা করেছি। স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা ব্যবস্থার দৈন্যতা নিয়ে বাম গণতান্ত্রিক জোটের পক্ষ থেকে যদি আন্দোলনের পরিকল্পনা নেয়া হয় তা হলে জনগণকে সম্পৃক্ত করা যাবে।
অণুজীব বিজ্ঞানী রুবায়েত হাসান তানভীর বলেন, করোনা মহামারির আগে বাংলাদেশে কোনও সংক্রমক রোগ মোকাবিলা করেনি। তাই হাসপাতালে মাইক্রোবায়োলজিস্ট, ক্লিনিক্যাল মাইক্রোবায়োলজিস্ট বা ভাইরোলজিস্ট তেমন একটা ছিল না। কেউ যখন একজন স্পেশালিস্ট ডাক্তার খোঁজেন তখন সংক্রামকরোগ স্পেশালিস্ট খুঁজে পাওয়া যায় না। যদিও অন্যান্য ক্ষেত্রে মেডিকেল সাব স্পেশালিস্ট অনেক ডাক্তার আছে। আরেকটা ব্যাপার হলো সরকার যত কথা বলুক অনেক সময় পেলেও তারা মহামারি মোকাবিলায় প্রস্তুত ছিল না, দেশের সাধারণ মানুষ এ সম্পর্কে তেমন কিছু জানবে না এটা স্বাভাবিক।
সরকারের বিভিন্ন বিভাগ থাকে, এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হচ্ছে আইসিডিডিআর,বি। মহামারিটা কিন্তু একটা আগুন লাগার মতো ঘটনা। আগুনের আকারটা যত ছোট তাকে ম্যানেজ করা তত সহজ। এই কারণেই শুরু থেকে মহামারি মোকাবিলার পদক্ষেপ নিলে কাজটা অনেক সহজ হতো। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সনাক্ত করাটা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। শুরুর দিকে পরীক্ষার প্রস্তুতিই ছিল না। আমার মনে আছে, প্রথম যখন আইসিডিডিআর সংবাদ সম্মেলন করলো, তারা তখন ভেবেছিল ১৫০০ কিট নিয়ে মহামারি মোকাবেলা করবে এবং আরটিপিসিআর ল্যাব একটাও ছিল না। এটা করতে অনেক সময় লেগেছে। আমাদের সক্ষমতার চাইতে বড় ঘাটতি ছিল প্রস্তুতি এবং দৃষ্টিভঙ্গির।
অভিনু কিবরিয়া ইসলাম বলেন, একটি মহামারি মোকাবিলায় নানা ধরনের মানুষের ভূমিকা প্রয়োজন হয়। আমরা শুরু থেকেই করোনা মহামারির ব্যাপারে সরকারকে সতর্ক করেছিলাম এবং বিশেষজ্ঞদের মতামত নেয়া ও সমন্বয় করার ব্যাপারে বলেছিলাম। সরকার একটা বিশেষজ্ঞ প্যানেল করেছিল কিন্তু তাদের কাছে কোন পরামর্শ চাওয়া হয়নি। যশোহর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে করোনা নিয়ে গবেষণার সক্ষমতার কথা সরকারকে বলা হয়েছে কিন্তু এব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে কোন প্রকার যোগাযোগ করা হয়নি। করোনা পরীক্ষার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে দক্ষ জনবল তৈরি করা হয়নি। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা বায়োলজি পড়েন এবং পাশ করেছেন তারা এ পরীক্ষায় সক্ষম। কিন্তু তাদের কাজে লাগানো হয়নি। করোনা পরীক্ষার ল্যাব স্থাপন থেকে শুরু করে নানা পর্যায়ে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। আমরা একটি কার্যকর ভ্যাকসিনের ডিজাইন তৈরি করেছিলাম কিন্তু আমাদের ল্যাব না থাকায় কাজটা এগিয়ে নিতে পারিনি। ভ্যাকসিন নিয়ে ৪০ বিলিয়ন (চার হাজার কোটি) ডলারের বাজার তৈরি হয়েছে সে বাণিজ্য নিয়ে এখন প্রতিযোগিতা চলছে।